বস্তুপৃথিবীর রহস্য

মাহবুব মোর্শেদ

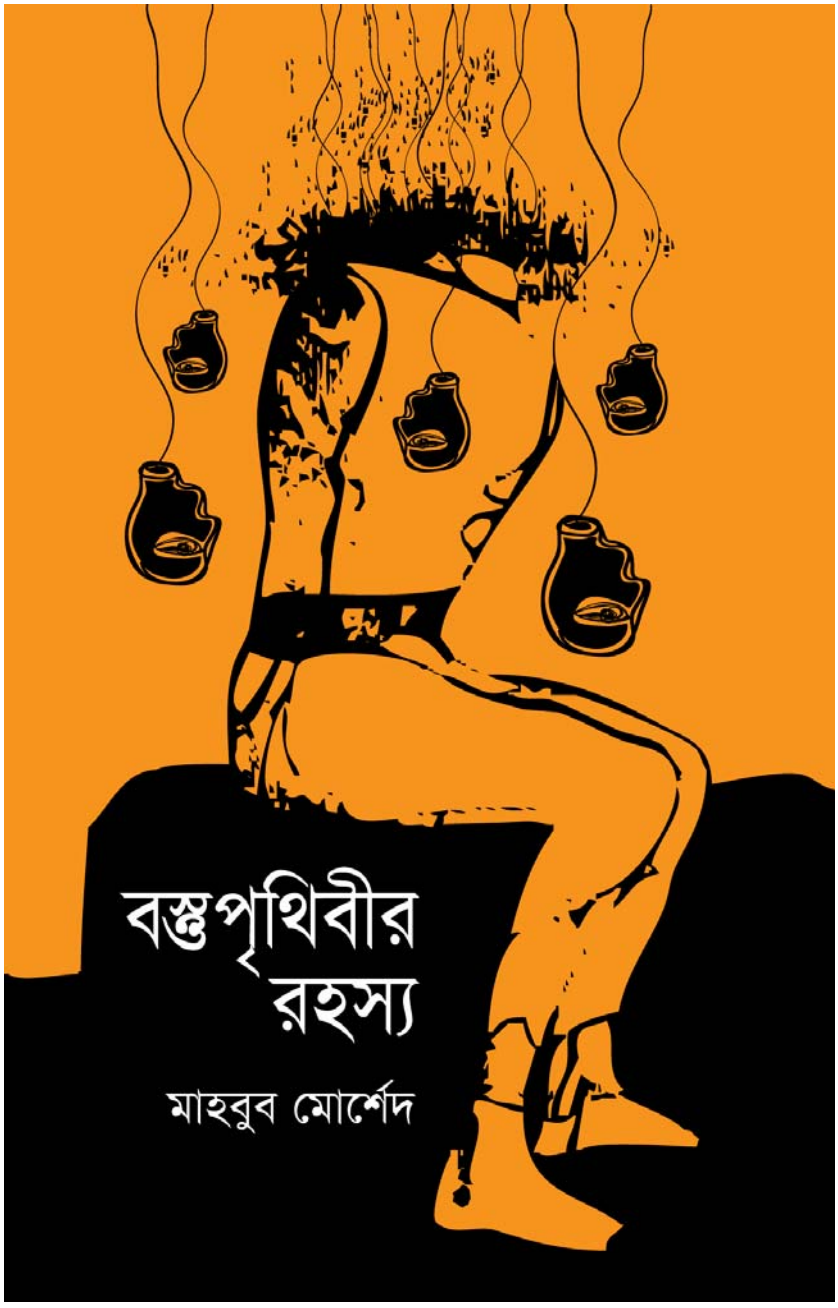

বস্তুপৃথিবীর রহস্য
মাহবুব মোর্শেদ

প্রথম অনলাইন সংস্করণ, ২০১০
দ্বিতীয় অনলাইন সংস্করণ, ২০১২
কপিরাইট : মাহবুব মোর্শেদ
প্রকাশক
সাময়িকী
www.samowiki.net
বইয়ের দোকান
www. boierdokan.com

প্রকাশকাল : ৩ নভেম্বর, ২০১০

প্রচ্ছদ শিল্পী : তৌহিন হাসান

This is a collection of poems named `Bostuprithibir Rohosso’ (Mysteries of the material world) by Mahbub Morshed, published Online only.

লেখকের অন্য বই
গল্প : ব্যক্তিগত বসন্তদিন, কাগজ প্রকাশন, বই মেলা, ২০০৬। দেহ, ঐতিহ্য, বই মেলা ২০১১।
উপন্যাস : ফেস বাই ফেস, ভাষাচিত্র, বই মেলা, ২০১০।

যোগাযোগ :
mahbubmorshed@ymail.com

উৎসর্গ

ক্ষুদিরাম বসু

হাসি হাসি পরবো ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি

শ্রাবণ

.....
ও শাওন, কবিকুলে প্রচলিত যত মাস আছে
ততো মাস নিয়ে এই কবিতা-নিচয়
তবু দ্যাখো, পত্রপুটে যতবার জল পড়ে থাকে
ততোবারই পাতা নড়ে, কুসুমকম্পনসম ক্ষীণধ্বনি
বাজে এ সংসারে।

আর সকলেই বরষার গান গেয়ে থাকে।

শ্রাবণ মেঘের কলা,
বিদ্যুতের ক্ষিপ্র ইশারায়, মনে হয়
নিকটেই বাজ পড়ে গেল। কবি তাহা
নানা ঠাঁই সাজায় বাজায়...

শাদা পাতা, শুভ্র পৃষ্ঠ তার ভিজে ওঠে আহা।
বরষার করুণা অপার।
মেয়ে আর কালো পাড় শাদা শাড়ি তার ভিজে যায়।
বরষার করুণা অপার!
যেন সিনেমায়, বহু বর্ণ গন্ধ গান। নেচে যায়
একালের সবচেয়ে সফল নায়িকা, নৃত্যকলা পটিয়সী
কোমল বরণ!
বিশ্বপ্রেক্ষাগৃহ হতে
বর্ষা আর ধ্বনিকলা তার
অনুরাগ জন্ম দিয়ে যায়।

তাহলে রবিন বাবুর কথা বলি...

আগাম বন্ধ হওয়া স্কুল ছুটি হলে
বেশি টাকা ভাড়া দিয়ে বাড়ি ফেরে মেয়ে
রিকশায়, হুডের ফাঁকে ফাঁকে, যতটুকু চলে
ততোটুকু ঝাপটা দেয়
শ্রাবণের মাতাল ছেলেরা।
যতোটা নিজেকে না ততোটাই টেক্সট বই বাঁচাবার ছলে
মেয়ে সরে সরে যায়।
গান নয়, তাই মনে হয় : এই বুঝি টেক্সট ভিজে যায়।

তাহলে রবিন বাবুর কথাই বলি

টেক্সট ফেলে রেখে মেয়ে
একেলা উঠেছে ছাদে।
আপনার বুক হতে সৌরভ দিতেছে সমীরে।
দ্রুত হাতে কিশোর রবিন হতাশ্বাসে টুকিতেছে তাহা।

তাই ঘোর বসন্তের রোদে শ্রাবণের কথা বলি
বৃষ্টিরাশি, বাদল সরকারের কথা বলি।

শ্রাবণ হে পরনারী, বাতাবী কাঁঠাল আম
গন্ধশত ভুলে অভেদ তোমার কথা মনে পড়ে আজ

রঙপুর হতে তুমি যে সকল দেয়াললিপিকা
গুহাচিত্র, ধ্বনিময় বৃষ্টিরাশিসম
পাঠায়েছ মেঘের ওপর, আমাদের পরবের দিন।
সপ্তম বরণে তাহা রঙধনু রূপে
বর্ণিত হয়েছে এই ওঁরাও নগরে।

তাই আমাদের পরবের দিন বৃষ্টিপাত ঘটে,
রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকে। রাষ্ট্রযন্ত্র ভাল চলে
ট্রাফিকবিহীন।

বীজ

.....
বৃক্ষ নয়, বোধি নয় বীজ

বাসনার গর্ভ থেকে পরিস্রুত হতে হতে
বাড়িয়ে দিয়েছো ডানা।

গৃহ, স্মৃতি, ধর্ম ভুলে কিছুকাল
পানীয়র মতো সংহতি-তরল ক্রমাগত নিয়েছো অন্তরে।

আহা বীজ! কেন প্রথম সুযোগে
ফল থেকে পাখির উদরে,
দগ্ধ হয়ে অকস্মাৎ
মাটিতে পড়েছো?

আহ, বলে প্রথম শিৎকারে
মাটিতেই প্রবেশ করেছো একা!

রিকা পর্ব

.....

.....

১.

দুপুরবেলা আমি ছেলেধরা হয়ে যাই।

আমাদের গ্রামের ছেলেরা ছোটকালে
পাখিধরা হয়ে যেত। শালিখ ধরে এনে কথা শেখাতো।
ছোটদের ধরে এনে আমি দুষ্টামি শেখাই
বলি ‘রিকা রিকা’ বলে বেড়াও তো

ওরা দুইবার ‘লিকা লিকা’ বলে পালিয়ে যায়

মেলা থেকে শাড়ি এনে দেব, পুতুল দেব
একবার রিকা বলো তো সোনা।
আগে ছেড়ে দাও বলে ওরা
জিহবা দেখিয়ে পালিয়ে যায়।

আর আমি একা একা পাখিদের মতো
একস্বরে একমনে আপনার নাম বলতে থাকি
ছোটছেলেমেয়েদল পেলে টুপ করে শিখিয়ে দেই
রিকা রিকা...’

২

তাহাদের দৃষ্টিগান বৃক্ষপত্রালাপের মতো
আমাদের মনে লেগে আছে। আর আমাদের বৃষ্টিগুলি
আমরা ঠাকুরের গ্রামে ৬৪ কিলোমিটারে রেখে আসি।

অরুণিমা সান্যালের মুখ দ্বিতীয়বার ভাসাভাসা শুশুকের ন্যায় আমাদের মনে পড়ে কি পড়ে না।
সেই সূত্রে, সেই সূক্ষ্ম সূত্ররেখা ধরে আমরা গান গেয়ে ফিরি। আর কবিরা খেজুর বৃক্ষের মতো স্থিরচিত্রে দাঁড়ায়ে থাকেন। দীর্ঘ জোব্বা পরিহিত কবিদের মতো তারা
পুচ্ছ ও প্রেক্ষাপটে
অপাত্রে
অপার অশনি সংকেতে
ভীতমুখে কেবলি দাঁড়ায়ে থাকেন।

তাহাদের নদীগুলোর নাম জলশব্দের মতো

আমাদের দেহে লেগে আছে।

৩
ওই অতিদূরে পৃষ্পধ্বনিময় দুটি বৃক্ষ
দুটি গাছ, মোহ ও আবেগের মতো মাথা নাড়ে
দোলায় মাথা
ইষৎসম্মত হয়ে পরস্পর দাঁড়ায়ে রহিবে বলে।
আর কোথাকার কোন ঠাকুরের গ্রামে
একটি বৃক্ষ, একটি গাছ
তাহাদের বৃক্ষফল ও রাশিফলে সিংহের ছাপ, ভাব ও ভাষা পেয়ে
বিস্রস্ত শিহরণগুলি সাজায়, সাজাতেই থাকে...
ফলে
কম্পমান গাছকে
কেশভারে স্পন্দনশীল নারী বলে মনে হয়।

সেজে-গুজে নার্সারি কেজি অনে পড়া
শিশুদের জন্য অপেক্ষমান মায়েদের মতো
স্কুলের গেটে বৃক্ষগুলি
মাতৃবাৎসল্যে আমাদের জন্য কত মাথা নাড়ে
মাথা দোলায়!
আর আমরা সহপাঠী, পাঠিনীদের সাথে
পৃষ্ঠদেশে জ্ঞানভার বেঁধে নিয়ে
ক্রমাগত ছুটে যাই
ছুটিতেই থাকি।

৪
কিছু পথ পঞ্চগ্রাম শিলিগুড়ির দিকে
কিছু আধো আলো-আঁধারিতে
পুরনো মন্দিরের পাশ দিয়ে...।
প্রতিটি ফলকে, টেরাকোটায়
রিকা তার রেখে গেছে
নাম-ধাম চিত্র-কলা। টেরাকোটা পোড়াতে দিয়ে
মেয়েরাও চলে গেছে ঘরে, জ্বালাতে প্রদীপ।

রিকা যায় নাই। শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে
মাটি পোড়াবার ঘ্রাণ নিয়ে
থির বসে আছে।

দোল পূর্ণিমার রাতে এইখানে মেলা হতো।

অর্ধেক মেলা শেষে রিকা কবে চলে গেছে
ঠাকুরের গ্রামে।
আর কেউ বিছা নাকফুল সিঁদুর পুতুল
সিঁথিপাটি নিয়ে পসরা সাজিয়েছে।
আড়চোখে তাকিয়েই সেই কবে রিকা চলে গেছে
সাঁওতাল মেয়েদের সাথে।

৫
জলের ওপর দিয়ে জল ভেসে আসে
সেই ভাবে তুমি ভেসে এলে

ভাসো নাই।
জলের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে
পুরনো বেদীর গায়ে ঠেস দিয়ে
আছো।

ওইখানে ম্রিয়মান আলোয় আলোয়
শুকাতে দিয়েছো চুল

পর্যটক দল শুনেছে মাদল
এইসব দেখে নাই তারা।

৬
গ্রামের ছেলেমেয়েদল রিকাকে দিদিমণি
বকুলকে ও বকুল
আর কাকে কাকে কী কী যেন ডাকে।
তাহাদের শিশুপাঠে চাঁদ ওঠা বড় কিছু,
বড় বেদনার।

ওরা চাঁদের জন্য বসে থাকে রাতে
বাক্য বানায়-
ওই চাঁদ উঠিয়াছে দেখো।
ও রিকা, দিদিমণি, পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে দেখো।

৭
ঠাকুরের গ্রামে ছোট ছোট পাড়ায় পাড়ায়, মাঝে মাঝে বয়ে গেছে বিল ঝিল,
নদী টাঙ্গন। সেইখানে এক গ্রামে রিকা থাকে। তার সেই বাড়ি হতে আসন্ন

আশ্বিনে মাড়াই কলের ধোঁয়া দেখা যায়। আখের গাড়িতে বাহিত সুমিষ্ট আখরাশি, যাহা কিনা ঘাসের স্বজাতি, ইহাদের- তারা সব দেখে থাকে অবনীন্দ্র ঠাকুরের সনে। রিকা ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনে বৈকালিক চায়ের আসরে ধূমায়িত অগ্নির সকাশে নানামুখি গান গেয়ে থাকে। আর জলাশয়ে, বিভিন্ন কাশের বনে আজি এ আশ্বিনে ঠাকুরের গ্রাম কাঁচসম ঝলকে ঝলকে। সেইখানে রিকা তার ২২ শে শ্রাবণে পাড়ায় পাড়ায় অবিরত লিখে যায় নামাবলী ইহাদের, বিনয়ের, অবিনীত আকাশের, ধোঁয়াচ্ছন্ন গোধূলি মেঘের। এই কাশ, তুমি সখা তার প্রাণে কোন অবকাশে আরবার ফুটিয়াছো প্রভু? আর হে কদম তুমি ঈশ্বরীর হতে দূরে, অদূরবর্তী মেঘের উপরে না হয় ফুটিও এই পৌষে অথবা আশ্বিনে। আরও ধীরে জীবন বাবুর সাথে রাস্তার মোড়ের দোকানে চা খেতে খেতে স্থানীয় কাউকে না হয় জিজ্ঞাসিও কোন পথে যেতে হয় রিকাদের বাড়ি। এই শীতে নিশুতি প্রহরে। তারপরে হয়তো চলিলে একা যেই পথে তারা দুই বোন কলেজের মেয়ে হলে রাতভর ঘুমিয়ে, না ঘুমিয়েও থাকে। দ্বার খুলে মিলে মিশে দুই বোন যখন প্রভাতে উত্তরের পানে রয়েছে তাকায়ে, সোয়েটারে ঢাকা তার লাল জামা। তখনও হয়নি চা, আবারও ডাকেনি মা। তখন ও প্রাণ তুমি শিলিগুড়ি হতে এসে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাতে অবকাশ নিরসিও ভাই। যাতে ওই হিমালয়, তাকালেই দেখা যায়। রিকাদের বাড়ি হতে সেই হিমালয়।

এই প্রেম

.....

এই প্রেম অগ্রন্থিত পুষ্পরেণুর মতো বাতাসে ভেসে এসে তোমার চুলে,
বিদেশী তুষারপাতের মতো পড়েছে হঠাৎ। এখানে তোমার আমার মাঝখানে
কোনো
দোভাষী নেই। অধ্যাপকীয় টেবিলের অপরপ্রান্তে চুপ করে বসে নেই তুমি।
ক্ষমতা ও আনুগত্যের সুশীতল ছায়া থেকে তুমি সরিয়ে নিয়েছো দেহ।
প্রতিবিম্ব।

তবু কথা ও গানের বদলে বেতার তরঙ্গে, সংকেতে
প্রকাশিত হচ্ছে তোমার প্রতি আমার অনুরাগ, ক্ষুধা ও অভিমান।
ভুল হয়ে যাচ্ছে।
মধুরতম বচসার ইঙ্গিত ভেবে ভুলক্রমে, তোমার অনাস্থার দিকে
বাড়িয়ে দিচ্ছি হাত।
পথে তুমি ঠিকানা রাখোনি। চিহ্ন রাখোনি কোনো।
ভাবছি, নিজের থেকে এবার কীভাবে ফেরাবো এই হাত।

পার্টি ও প্রেম

.....

শ্রেণীসংগ্রাম নিয়ে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তোমার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিশে যাচ্ছে আমার দৃষ্টিপাত। মার্কসবাদের কী অবাক মহিমা! ব্যক্তিগত জীবনের কথা অনুক্ত রয়ে গেল, তবু প্রোলেতারিয়েত, পার্টিলাইন, অক্টোবর বিপ্লব এইসব সংকেতের আড়ালে নিরব গেরিলার মতো বেড়ে উঠছে আমাদের প্রেম।

মার্কসবাদ তোমার দৃষ্টির শুভ্রতার নাম
তোমার গোপন হিংসার নাম পুঁজিবাদ
বসে থাকবার বিষণ্ন ভঙ্গির নাম লেনিন
দীর্ঘকৃষ্ণ কেশের নাম নারীর ঐতিহাসিক পরাজয়
প্রতিটি কটাক্ষের নাম রাশিয়া, চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম

পুরুষেরা বিপ্লব ভেবে যাতে ঝাঁপ দেয় তার নাম পুঁজিবাদ
আর প্রেম ভেবে যাকে আলিঙ্গন করে তার নাম প্রতিবিপ্লব।
তবু বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব, প্রেম ও পুঁজিবাদে মাখামাখি হয়ে থাকে আমাদের সান্ধ্যঅবসর। তোমার দীর্ঘশ্বাসের আড়ালে আমার প্রতিনিঃশ্বাস, উত্তাল দৃষ্টিকোণের গভীরে আমার উৎপ্রেক্ষার আবরণ।
আর আমাদের প্রেম বেড়ে উঠছে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের দ্বন্দ্ব ও দ্বিধায় দোদুল্যমান,
অনভ্যস্ত, দীর্ঘকাল পর পার্টি অফিসে ঘুরতে আসা লুম্পেন প্রোলেতারিয়েতের মতোন।

স্টিল লাইফ

.....
এক গ্লাস জল, লেবু ও লবণ।
টেবিলে কিছু নেই।

মা তার মায়ের বাড়িতে চলে গেছে শীতে।

আজ ফের রান্নাবান্না হবে। লেখা হবে, পড়া হবে।
পাশের বাড়ি থেকে দু'পদ আসবে এপাশে।
বাবা-মা বাড়ি নেই। গ্রামে চলে গেছে।

সকাল সকাল পোস্টাপিস দেখে এলাম।
আজ কোনো চিঠি নেই।

দিন আজ চিঠি লেখে নাই।

আপেল

.....
আপেলের দিকে তাকালে লগ্নীকৃত পুঁজির
বিস্তার মনে পড়ে।

আপেল, তোমার মাঝে নিহিত ইতিহাস
বাগানের ঘাসে অকস্মাৎ তোমার ঝরে যাওয়া
ক্রেনে ক্রেনে তোমার নিথর স্থানান্তর
তোমার ক্রমিক রক্তিমাভা...
ওই এক আপেলের ভেতরেই গ্রন্থিত।

এমনকি তোমার ক্ষুদ্র দেহের ওপর ছাপাঙ্কিত ব্যাজকেও ইতিহাস মনে হয়।

জানালা

.....
যে গৃহিনী ব্যস্ত রজনীব্যাপী রান্নাবান্না সেরে
তোমার লোহায় মৃত গোখরার মতো স্তন ঠেকিয়েছিল
তাকে আপেলের উপমা থেকে রেহাই দিও।

বিজ্ঞাপন চিত্রে গচ্ছিত আপেলের চেয়ে
অন্ধকার রাতের পায়রা
আরও বেশি গুঞ্জরিত, পালকমুখর।

রান্নাবান্নার ঘ্রাণ নিয়ে
দৈবপ্রণয়ের কথা ব্যক্ত করো না।

মেলা

.....
বিধি, তোমার সকাশে
মঞ্জির ও খঞ্জনীর সুরে
প্রশ্বাসে টেনে নিচ্ছি গান

চমৎকার দৈব অনুমান।

শিশ্ন

.....

বিকেলের বিষন্নতা থেকে উত্থিত হতে গিয়ে থির থির কেঁপে যাচ্ছো, হে
সায়াহ্ন।
আমি তোমাকে দিয়েছি মনুমেন্টের মতো সুউচ্চ প্রসারতা। প্রাঙ্গণের হাস্যরস।

মেঘ থেকে ঝরে যাচ্ছে শিশির কেন্দ্রেরও কেন্দ্রের দিকে। আর অবসন্নতা, আমি
ভাবছি
তোমারই গভীর থেকে- ফোঁটায় ফোঁটায় উত্থিত হচ্ছে জল।
কোলাহল।

আত্মা

.....
স্তব্ধ চোখের মুগ্ধ আরাম থেকে হিমানী প্রপাতে
ফেননিভ শয্যার মতো শুয়ে আছো।
মৃত্যু, প্রেম, ঘাস, আকাশ, চৈতন্য, প্রভা
নিশ্চেতনা ও স্ফটিকের অস্তিত্ব নিয়ে
সমর্পিত হয়ে আছো
মৃত্তিকার গোপন ইচ্ছার কাছে।
এই দূর অশ্রুসম্ভুতবেদনা
বেঁচে থাকা থেকে
শুধু দৃষ্টিহীনতার ভারে মুক্ত হয়েছো।

নীলিমাসম্পাতে যে আকাশ
নিখিলের সমস্ত ক্ষীণপ্রভাকে পান করে ফেলে
সেই ভারাক্রান্ত উজ্জ্বলতার আড়ালে চলে গেছো
দেহ রেখে, একা।

ঘটনা

.....
দৃশ্যপটে আমি নেই।
নানাস্থানে ছাইভস্মের সাথে ইতস্তত
দেহখণ্ড পড়ে আছে।

অথবা শান্ত পানীয় জলের গ্লাসে পরিশ্রান্ত চুমা।

আত্মমগ্ন বনের দিকে যাত্রা করেও বহুবার
ফিরে গেছি বনস্মৃতিভ্রষ্ট পাহাড়ের সানুদেশে। দূরে অপরূপ
সমুদ্রতীরে গোপনে বাড়ছে
আমার হন্তারক।

অনন্ত

.....
তড়িৎসংকলিত দেহে আলো নিবে গেলে
দূর তারকামণ্ডলে জ্বলে দূরতম
উৎসজ্বলাধার।
মহাজগৎসংসার।
পুরুষের আকার চেতনা ও নৈঃশব্দ্য ছুঁয়ে
বারংবার
গুঞ্জরিত দার্শনিক ঘরানার মতো।

এ ভবতরঙ্গে আজ আধেক নেমেছে শীত
আধেক সঙ্গীত। নৃত্যভঙ্গিমার শিরে
নাচিতেছে
তব স্বর্ণজল।
এ মদমত্তজলে
ভেসে গেল টেক্সট
ধর্মপুস্তকের বাণী
জ্যামিতিক আকারে-প্রকারে।
প্রতিমা গোপন করে
অকালবোধনে গেল আদিবাদ্যদল।

জোৎস্না

.....
আমি তোমার ঘননীল জোৎস্নার দিকে
বাড়িয়ে দিয়েছি বৈদ্যুতিক আলো।
তুমি বিদ্যুৎ বিভাগকে ক্ষমা করে দিও।

পৃথিবীতে অনেক বৈদ্যুতিক উত্থান ও পতন হলো
নদীশাসন করা হলো। তড়িৎ সম্পাতে বহু লোক মারা গেল।
তবু বিদ্যুৎ আছে বলে
তার বিপর্যয়ের পর সহসা
জোৎস্না চোখে পড়ে।

অন্ধকার

.....
আদিগন্ত দেশকালহীন এই মন্দ্রিত অন্ধকার।

বর্ণ বিপর্যয়ের ভোরে বস্তুর মাত্রাগুলো
মিলিয়ে গিয়েছে দুইটি রঙে।
বাস্তুহারা ভুবনে তখন শুধুই আকাশের নীল ও ঘাসের সবুজ।
হরিদ্রাভ অবিরাম অন্ধকার।

আকাশ চুঁইয়ে জল
নেমে আসছে
অনন্তআকাশে
আমি অন্ধ
পান করো, তুমি অন্ধকার।

বিড়াল

.....

সভ্য পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটে, এই বিড়াল।
রৌদ্র ও পূর্ণিমা লোফালুফি করে গৃহকোণে আজও তার ব্যক্তিত্ব ও বন্যতা নিয়ে টিকে আছে। বনস্মৃতিমুগ্ধ নম্র বিড়াল বংশপরম্পরায় মখমলের আরাম ও মাছের অবশেষ ভালোবেসে গেল। প্রাণীকুলে শুধুই বিড়াল, সভ্যতাকে বাধ্য করেছে তার প্রসন্ন স্বপ্নের সাধ ও অবসন্ন মিষ্টি বিষাদ নিয়ে উৎসবে প্রবেশাধিকার দিতে।
আজও তাই প্রশ্নহীন এই ক্ষুদ্র বিড়াল সমাজ।

চীনা খাবার

.....

জটিল পদ্ধতি মেনে রান্না করা হয় বলে দেশে দেশে চীনা খাবারের বিশেষ বাণিজ্য আছে। এমনকি যে চা আমরা প্রত্যহ পান করি তাও চীনাদের আবিষ্কার। চা খেয়ে রবীন্দ্রনাথেরও মুগ্ধতা এসেছিল। তাই তিনি চায়ের জন্য একটি বিজ্ঞাপন লিখেছিলেন। আজও চা কোম্পানিগুলো এই বিজ্ঞাপন ছাপায়।

অতএব, অনেক চ-কারান্ত শব্দের সাথে চা-ও আমাদের দেশে চীন থেকে এসেছিল, বলা যায়। তখন বাংলার মসনদে কার শাসন ছিল কে জানে।

চিঠি

.....

কালো একটি খামে চিঠি পাঠিয়েছো।

আলো জ্বালাবার দেশলাই খুঁজতে গিয়ে ব্যাঘাত ঘটলো তোমার ঘুমে। পাশ ফিরে শুতে যাচ্ছ তুমি। আজ তুমি টের পেয়ে গেছ।

দূর থেকে আসা তোমার চিঠি

অন্ধকারে না পড়াই ভালো।

মিডিয়া

.....

দু'হাত প্রসারিত করে আলিঙ্গনে যাবার প্রাকমুহূর্তের ভঙ্গিমায় যাকে আস্বাদন করে যেতে হয়- ব্যগ্রব্যাকুল অভিনিবেশের সাথে; সেরকম একটি নিউজ পেপারের ছেঁড়া টুকরো ক্ষেতের ওপর পড়ে আছে। পার্কের বেঞ্চিতে, কাগজ কুড়ানো ছেলেদের হাত ঘুরে, হোটেলে- পিঁয়াজুর মতো সুস্বাদ খাবারকেও মুড়ি দিতে পেরে, এক সফল, চাঞ্চল্যকর দৈনিকের টুকরা তার অক্ষর সর্বস্ব হলদেটে হৃদয় নিয়ে অক্ষরহীন এক চষা ক্ষেতের ওপর এসে পড়েছে।

উড়ে এসে জুড়ে বসা এইসব খবর কাগজ- খণ্ডিত, অর্ধসত্য, ধুলোমলিন। তবু তার সুসভ্য ছাপার হরফ- ব্যক্তিত্ব ও বিজ্ঞতা নিয়ে হ্যান্ডমাম।

সভ্যতার এক আজব প্রতিনিধি ভেবে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় দূরে, তার মিথ্যা জ্ঞান, তথ্যবিভ্রাট, হলুদ বর্ণ সহকারে- লোকালয়ের দিকে হাওয়ায় হাওয়ায়।

ভাব

.....

একবার জলের গভীর থেকে, একবার নীলের গভীর থেকে আমার চোখে এসে পড়লো তোমার রৌদ্রালোক; হে অসীম, তোমার প্রশ্রয়ে আমার নদীতীরে বেড়ে উঠছে নামরহিত লতাগুল্ম, সংখ্যাহীন ঘাস। ফুটছে বনফুল এ জগৎ ও জীবনের প্রতি লিপ্ত কৌতুহলে। তোমার বিশ্বব্যাপ্ত নজর থেকে আমার কম্পিত দ্বিধার আড়ালে লুকিয়ে ফেলেছি সেই ফুল। তার গোপনতা তোমার আকাশের ব্যাপ্ত নক্ষত্রের কাছে, হেলাফেলা ছন্নছাড়া নির্লিপ্ত বিভার কাছে প্রকাশের আগে; পরিচর্যা ও প্রশ্রয়ের অন্তরালে, তোমার সৃষ্টিবোধের মহাকৃতির মাঝে কোথায় রাখবে সে গভীর আত্মঘাতের ভার? কোথায় তোমার লৌহ ও তাম্রপ্রতিভার ঢাল, যা আমার দ্বন্দ্ব ও দ্বিধাকে রুখে দেবে নিবিড় পরাক্রমে.....

রাত

.....

এই দিনগুলো সেইসব রাতের প্রতিনিধি- যখন পৃথিবীর একটি বাতিও নেভানো হয়নি। এই রোদ, সেই রক্তিম আসরের নর্তকীর ভ্রুভঙ্গির মতো জমজমাট। তার সহকারীনির চোখে ঘুম, বাদকদলের সঙ্গতের হাই উঠছে বারবার, তবু এই দিনগুলো নেচে যাচ্ছে ঐ নর্তকীর রক্তের চঞ্চলতা নিয়ে। আজ, রাতগুলোর কথা লিখে রাখছি একটুখানি মোমের আলোয়। লিখে রাখছি, সম্রাটের তৃতীয় পূত্রের ঔরসে জন্ম নেয়া জারজ বিদ্রোহীর কথা।

ফুরিয়ে যাচ্ছে মোম, কলমের কালি। তবু এই গ্লাসের পাশে পত্রিকা, পত্রিকার পাশে অভিধান এবং সিগ্রেটের ছাই মেশানো চায়ের অবশেষের পাশে এমন এক রাতের কথা লিখছি যখন, একটি বাতিও নেভানো হয়নি। জেগে আছে নর্তকী এবং পৃথিবীর শেষ সম্রাট।

ফড়িং

.....

পেয়ারা গাছের ছানা ফড়িং আজ বাগানবাড়ির রেলিং টপকে অতিদূর মাঠ পর্যন্ত উড়ে গেছে। গরুর পিঠে বসে ভেবেছে পৃথিবীর দিকে দিকে কত ঘাস উড়বার কত অধিকার। মা তার মাসির কাছে খবর জেনেছে, দূরের মেঘ আসছে বৃষ্টি ঘটাবে বলে। তাই সে এ ফড়িং সে ফড়িং বাগান তোলপাড় করে জেনে নিচ্ছে তার মেয়ের খবর। সমস্ত ফড়িং আজ উড়বে আকাশে- কেউ কি তাদের মেয়েকে দেখেছে? দেখে মাঠের কিষাণ গরু তুলবে ঘরে, ফেলে রেখে ধান। নিখোঁজ ফড়িংটি এই কৃষকের পিছু পিছু গ্রাম অবধি চলে যাবে। কুপির আগুনে শরীর গরম করে নিশ্চিন্তে ঘুম দেবে মাটির দেয়ালে।

বিদায় অভিশাপ

.....

আজ বহু রাত ও রংয়ের দোকান ঘুরে তোমার জানালার পাশে দাঁড়িয়েছি।
যতবার এই চিলতে মেঝেয় পা ফেলছ, ততটা ফুল গাছের থেকে চুরি করে
রাখছি পকেটে। গন্ধে গন্ধে ভরে যাচ্ছে আমার শরীর।
সন্ধ্যা থেকে নিশ্চুপ প্রতিবেশিনীর ঘর। তার চালে খসে পড়ছে ছোট ছোট
করুণাকুসুম। বৃক্ষজন্মের পাঠ সাঙ্গ করে পিতৃগৃহে ফিরবার সময় হলো।
এবার ফুল তোলা নিয়ে কিছু অনুযোগ করো।

দরোজা

.....

খোলা পেয়েও প্রবেশ করিনি।
কড়া নেড়ে অনুমতির অপেক্ষায় ছিলাম। মন্দিরের দরোজা ভক্তের জন্য সর্বদাই খোলা। তবু গৃহস্থপনার দায়ে দরোজা দেখলে আজও অনধিকার প্রবেশ মনে হয়। যখন গৃহ ছিল না, প্রান্তর ছিল মুক্ত। তখন দরোজার বালাই ছিল না কোনো। আর কড়া নেড়ে খোলা দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার রেওয়াজ এলো গৃহস্থপনার পাঁচহাজার বছর পর।

ঠাকুমার মেয়ে

.....

ঠাকুমার আদুরে মেয়ে, মন দিয়ে শোন, ওই গোমড়ামুখো বাদামচাষীর ছেলের সাথেই শেষ পর্যন্ত তোমার বিয়ে ঠিক হলো। ঠাকুমা তোমাকে বকতে বলেছে, কেন তুমি একটা মুসলমান ছেলের সাথে রঙঢঙ করে বেড়াও। তোমার ঠাকুর্দা ওদের দিয়ে চটিও পরিষ্কার করাতেন না। শনিবার লগ্ন, বৃহস্পতিবার গায়ে হলুদ, তুমি সোমবারেই এসো। পরীক্ষার কথা বলে আবারও বিয়ে পিছিও না। বড়দা'র মেয়ে তোমাকে দেখকে চাচ্ছে। ঠাকুমার চশমা কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে, তাই এই চিঠি আমাকেই লিখতে হলো। ইতি তোমার ভাইপো জিতেশ।

গান

.....

আবারও সঙ্গীত বিদ্যালয়ের বারান্দায় তোমার সাথে দেখা হলো। ক্রমাগত হাত নেড়ে নেড়ে জন্মান্তরবাদের অভেদ নিয়মের কথা আলোচনা হলো। মানুষ কথা বলা শিখলো বেশী দিন হয়নি; তবু এরই মাঝে সঙ্গীত ও গান সমার্থক হয়ে উঠলো... এইসব... । একজন সুচতুর প্রশ্ন করে যাচ্ছি, অন্যজন এড়িয়ে যাচ্ছি ক্রমাগত। এভাবে অনেক প্রশ্ন জমা হলো ভুবনে। পৃথিবীর সকল খনিজ শেষ হলে একদিন এইসব প্রশ্নের মুখোমুখি হবে মানুষ। তখন সঙ্গীত বিদ্যালয় থাকবে না। তোমার কথা ঠিক হলে গানও থাকবে না পৃথিবীতে।

দুলদুল

.....

গরিব টাট্টু ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আমি গিয়েছি জল ও জাঙ্গাল পেরিয়ে পাহাড়ের সানুদেশে। চোরাকাদাময় ম্যাংগ্রোভ জঙ্গলে। ঘোর ভিনদেশে বিদেশী ঘোড়ার পা হড়কে গেল না কোথাও। লোভনীয় ঘাসের দিকে তাকালো না সে।

এঁদো পুকুরের বুক থেকে উঠে এলো সূর্য। দূরে অপরগ্রাম অপরূপ বনস্থলীর মতো সুসজ্জিত। তখনই আমার ঘোড়ার পা হড়কে গেল শুকনো মাটিতে। 'এই স্থান', বলে আমি লাফিয়ে নামলাম সেই স্থানে। জড়িয়ে ধরলাম মাটি। নেপালে ফেরত পাঠালাম আমার ঘোড়া। মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে, ফেরত এলাম মৃত্যুময় মৃত্তিকার নিকটে।

পরমহংস

.....

নারী এবং হাঁস, সূর্য উঠবার আগে দু'দলই লাফিয়ে নামে জলে- পালকে পালক, জলে জল সংঘর্ষ জাগিয়ে। চিরশুষ্ক, নির্বিকার। জলকে জলের ভেতর স্নান করিয়েছে নারী। বহুস্নাত হাঁস আমি দেখেছি, কোন পালক দেখিনি যাতে এক বিন্দু জল লেগে ছিল।

আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা আজ হাঁসের পালক আর নারীর চুলে ভরে গেছে। বৃষ্টিভেজা নারীর চুলও স্পর্শ করেছি, নারীর চুলকে নমিত করে এমন জল এখনো আকাশ থেকে গড়িয়ে পড়েনি। কেননা বাতাসে যদৃচ্ছা উড়বার জন্যই নারীর চুল।

যার একমাত্র প্রসাধন হাঁসের পালক, সে নারীর অধীনতা মেনে নিয়েছি আমি এবং চার চারটি পাতিহাঁস।

নারী এবং হাঁস- ঘুম ও রতির পর দু'দলই লাফিয়ে নামে জলে । পবিত্রতার জন্য এই প্রাকৃতিক তাড়নাকে জন্মাবধি ইর্ষা করে এলাম।

শোকলিপি

.....

এই শ্বাস আর ওই দীর্ঘশ্বাসের মাঝে বৃথা পড়ে আছে মরদেহ, কষ্টকল্পিত
শোকলিপির আড়ালে- জন্মজীবিতের প্রতি তীব্র কৌতুকে। এসো, সমস্ত
বর্ণভঙ্গিমা দিয়ে ঢেকে দাও তাকে।
শ্বাস ও প্রশ্বাসের ঘেরাটোপের মাঝে দোদুল্যমান, জীবন্মৃত- এসো, এসো সময়
ও সময়হীনতার টানে দ্বিধাবিভক্ত-।

সংকেত

.....

রেলস্টেশনের পাশে ওয়াপদার পানির ট্যাংকে লেখা আছে ‘নিরুদ্দেশ’, কাঁপাকাঁপা অস্পষ্ট অক্ষরে। এর পাশে যাত্রা, পুতুলনাচ, ঝুমুর দল- মেলা। অসীম মিষ্টান্নভাণ্ডার নিয়ে বসে আছে অখিল সরকার। দোকানের সামনে হালকা অক্ষরে লেখা আছে- ‘অবকাশ যাপন’।

শিউলি ফুল

.....

রাতের পোশাকে জমিয়েছি সমস্ত রাতের নির্যাস। শিউলি ফুল। অন্ধকার,
শিশির, রাত্রিতারকার স্তব্ধতা থেকে শিউলি ফুল নেমে এসেছে অভিকর্ষ ত্বরণের
দিকে ত্বরিৎ বিষণ্ন বাতাসে।
পতন নিশ্চিত হয়ে আছে প্রতিটি উত্থানে, যেমন প্রতিটি ফুল এস জমা পড়ে
ঘাসে, পৃথিবীর রাতের পোশাকে।

তান

.....

তোমার নিরুচ্চারিত গানের মতো এইসব কবিতা। সুসংহত, বিপন্নতার মতো প্রচ্ছন্ন। আর সেই প্রচ্ছন্নতার আড়ালে প্রকট হয়ে উঠছে জলকল্লোল, ট্রেনের শব্দ, বাতাসের ফিসফাস এবং তোমার কণ্ঠে শোনা ‘আসঙ্গলিপ্সা’ শব্দটি।
এমন হালকাভাবে কলম ধরে থাকছ তুমি- তাতে বড় হয়ে উঠছে অন্যের খাওয়ার প্রতি তোমার মনোযোগ।
বিদেশী অতিথির রূপোর চামচ হরণের গল্পটি বলাই যাচ্ছে না আর।

ময়ূর পর্ব

.....

.....

এক.

সারাটা দুপুর ডাহুকের খাঁচা থেকে পায়রার
খাঁচার সামনে দিয়ে ঘুরে এসে অকস্মাৎ
ময়ূরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছি। স্থানু,
আত্মমগ্ন শতশত ময়ূর ছড়িয়ে রয়েছে গাছে,
ঘাসে, বিকেলের কার্নিশে। নিখিল দুপুর জুড়ে ময়ূর-

ময়ূর বলে তোকে না ওই পাখিকূলকে
জাগাতে চেয়েছি- মেঘেরা জানে না। তাই
বৃষ্টির জন্য এই অধীর প্রাণপাত।
বৃষ্টিপাতের পূর্বাহ্ণে
মানুষের ভেতরের ময়ূর জেগে ওঠে- ক্রমান্বয়ে
নেচে যায়, জোৎস্নায়। ময়ূরকে ময়ূর না ডেকে তাই
বৃষ্টির দোহাই গেয়ে বসে আছি।
প্রসঙ্গত জানাই,
ঠিক একই কারণে কবিতায় ময়ূর অনুল্লেখ্য
থেকে গেল বৃষ্টির তুলনায়।

দুই.
আমার একটি বহুপাঠ্য পুস্তক রয়েছে। প্রতিদিন ঘরে ফেরার পর সাময়িক অবসন্নতা নেমে আসে। ঘুম ও জাগরণের মাঝামাঝি ঝুলে থাকি, গরম বালুতে মুখ গুঁজে। শরীরের ভেতর একটি অবাধ্য শিশু জেগে ওঠে। শুধু ঘুম নয়- সকল নৈঃশব্দ্যের বিরুদ্ধে সে তার সরব কান্না কাঁদতে থাকে মধ্যরাত্রির অবসরে। আমি তখন প্রিয় পুস্তকখানা চোখের সামনে মেলে ধরি। নিত্যকার অভ্যাসমতো ময়ূয়ের পালকচিহ্নিত অধ্যায়টি বের করি। থমকে গিয়ে একবার ভাবি, এ পালক যার- সেই ময়ূরের কথা। তখন ময়ূর বিষয়ে নিরব ও নির্বাক পুস্তকটি আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।

তিন.
‘ময়ূর’ শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে আমার মুখ
একটা তৃপ্তিময় স্বাদে ভরে যায়। নিমেষে তাকে
সুস্বাদ দ্রাক্ষাসুধার মতো পান করে ফেলি।
বিশেষত সম্মুখে, ময়ূর শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে
একটি গভীর ও গোপন চুম্বনের অনুভূতি জাগে।

ফলে, প্রকাশ্যে কখনো ময়ূর বলি না তাকে।

চার.
অবশ্য নারীদের কথা আলাদা, তারা ময়ূরের পেখম বিবিধ পাখির পালকের সাথে মাথায় গুঁজে নিয়েছে বহুকাল, নৃত্যের রীতি অনুসারে। কেননা জোৎস্নায়, নৃত্যরত বহুবর্ণিল আভার নাম ময়ূর। কোনো নৃত্যপর নারীর চুল থেকে খসে গিয়ে আজও কয়েকটি পেখম দরবারের জাজিমে পড়ে আছে, জলসাঘরের অশ্রুত কান্না, ঘাম, ঠাঁট আর সৌগন্ধ নিয়ে ইতিহাসের বাইরে ময়ূরের মতো গুম হয়ে আছে।
একাকী একটি পালক।

পাঁচ.

‘ময়ূর একটি বিশেষ ভাবুকপ্রক্রিয়ার মধ্যে নাচে।’ অনিলা স্মরণে, কমলকুমার মজুমদার

অথবা ধরো, ময়ূর, তুমিই সেই ময়ূর
মা ময়ূরের শুশ্রূষা থেকে পালিয়ে এসেছ এই অবাক শহরে
ধোঁয়ময় এই আকাশকে ভাবছ মেঘ আর জুড়ে দিচ্ছ তোমার
নাচ এই সন্ধ্যায়, কালো রাস্তার ওপর তোমার মিছিল।
পালকে নেচে উঠছে আলো,
আর কী অবাক! সরকারি ফোয়ারা বেয়ে উঠছে জল।
তোমার চারিধারে অবসন্ন, ক্লান্ত কোলাহল

মোগল মিনিয়েচার থেকে প্রকাশ্যে ধুলোয় নেমেছ
ধুলোস্নান করে তোমার পালক, শরীর আজ
বৃষ্টির অপেক্ষায় জেগে আছে

একথা গতকাল কাগজে পড়েছি
নিত্যকার অভ্যাসমতো হেলাফেলা তোমার ছবির থেকে দৃষ্টি সরিয়ে
বিখ্যাত নায়িকার ছবির মতো আরেক ছবির দিকে
দৃষ্টিপাত করেছি গোপনে। যেন রোজ ময়ূরের ছবি ছাপা হয়
পত্রিকার পাতায়, ডালে, বৃক্ষের ধূসর বল্কলে

অথচ ভাবো, বাংলাদেশে ময়ূর ছিল না কোনো কালে
ভারতের উত্তর থেকে কয়েকটি ময়ূর বেড়াতে এসেছিল শুধু
ধর্মপালের আমলে, তারা ধানক্ষেত ভালোবেসে রয়ে গেল-

এখনও এই দেশে তুমি ছাড়া আর কোনো ময়ূর দেখিনি-
নৃত্যরতা, একাকীত্বে বিভোর, গুঞ্জরিত
প্রাণপণ বৃষ্টির অপেক্ষায় জেগে আছ- এই ধুলোয় ধুলোয়

ধরো, তুমিই সেই ময়ূর।

বিজয়ী বীরের প্রতি

.....
বীরেরা চিরকাল গর্বের ঝলকটুকু নিয়ে মিশে যায়।
তোমার রথ হস্তিনাপুর থেকে অনেক দূরে-
ওই ইতিহাসের ধূলিমলিন পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় মিশে যাচ্ছে।

মনে রেখ, যে আলোয় তোমার রথ আলোকিত
যে আলোয় তুমি স্ত্রী-মুখ চুম্বন করে তৃপ্ত
সে আলোটুকুই আমি।

অর্জুন, আমার লাশের থেকে সরাও
এ বিজয়-পতাকা। কেননা তোমারই মতো
ওই পতাকাও একদিন ধূলিলিপ্ত হবে...

ইমরুল কায়েস

.....
উপত্যকায় উপত্যকায় অপ্রয়োজনে অনাকাঙ্ক্ষায়
ঘুরে বেড়াও তুমি; আমি তোমার চিন্তাকে স্পর্শ করেছি
এবং এও জানি- কিসের লোভে বৃষ্টি-বঞ্চিত মরুতে
ঘুরে ঘুরে উদভ্রান্ত হয়ে গেলে

চিরদিনই ইহজীবনের কাছে অবোধ্য রয়ে গেল
উপমা ও উৎপ্রেক্ষার ঠার, ধ্বনির মাদকতা আর
পংক্তির ঝাঁঝ। ততোধিক কবিদের উদভ্রান্তি ও চিৎকৃত মোহনীয়তা।

তোমার কবিতা মরুর বালুতে বিলুপ্ত,
চন্দ্রমাকে ঢেকে দিয়েছে সূর্যস্পর্শ- তবু, ইমরুল কায়েস, জানি,
মস্তিস্কের গোপন পদ্মের রসক্ষরণে তুমি মাতাল,
বিপন্ন ও ঈশ্বর-বঞ্চিত। প্রদক্ষিণ করছো বেদুঈনদের তাঁবু
আর সুখময় রাতগুলি-
করুণ উষ্ট্রের পিপাসার্ত হৃদয়ে মিশে গিয়ে...

প্রিয় ফারজানা

.....

শুনেছি, তোমার মেয়ের নাম ঋতা রেখেছো। সে আবার তোমার শত্রু না হয়ে পড়ে! এবার ছেলে হবে- দেখো। ছন্দার কাছে শুনলাম তিনমাস হলো? তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই আর। সময় করে তোমার বরকে এসব বুঝিয়ে ব'লো। তোমরা দু'জনেই চেষ্টা ক'রো আমাকে চিরতরে ভুলে যেতে। আর তোমাদের মেয়েকে কখনো বোলো না ঋতা নামে ওর একটা দূরের- অনেক দূরের এক খালামণি ছিল।

সিনেমার নায়িকার প্রতি

.....

আমাদের উভয়ের জন্য সুসংবাদ এই যে, আমরা পরস্পরের ভ্রাতা ও ভগ্নি নই। কার্যত কোনো ভাই-ই তোমাদের বোনরূপে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত নয়। কেননা তোমরা কাম জাগ্রত করো।

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, যে সুন্দরীরা মিশরের নগরপথে স্তন উন্মুক্ত করে বসে থাকতো- তাদের কিসমিস বাগানেও মাছির উপদ্রব হয়েছিল। পুরাণে এমন নগরের উল্লেখও আছে যেখানে নারীরা তাদের বাম স্তন কখনো ঢেকে রাখেনি। সম্রাটের মনোরঞ্জনের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল যারা- নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা তাদের এতোই মোহিত করে তুলেছিল যে, তাদের ক্ষুদ্রতাকে কুয়াশার আবরণ দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হতো। এতোই ছিল তাদের রূপের গর্ব- তারা যখন অনুগত ভঙ্গিতে সম্রাটকে কুর্নিশ করতো তখনও রানীদের খাসকামরার কাঁচ কেঁপে-কেঁপে উঠতো, মুহূর্তেই এঁকেবেঁকে যেত রাজকন্যাদের প্রতিবিম্ব ।

এখন তোমরাই সেইসব নারীদের নাম বলো, কেননা তা সম্ভব নয়। নামের প্রসঙ্গে তোমরা যা উচ্চারণ করবে তা হলো- পৃথিবীর সমস্ত নর্তকীর সম্মিলিত দীর্ঘশ্বাস। আমি রূপমুগ্ধ। আমরা যেন পরস্পরকে অভিশাপ না দেই। কেননা তোমার রূপ ও আমার মুগ্ধতা কেউ কারো জন্য নয়। বিশ্বাস না হলে সম্রাটের টাকশালের যে কোনো কর্মচারীকে ডেকে আনো।

ফ্রাঞ্চেসকার প্রতি

.....

নষ্টনীড় গল্পটা কি শেষ করেছ?
ওর ব্যাখ্যা পাবে আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথে-
ভুলে তোমার টেবিলে ফেলে এসেছি। প'ড়ো।
পরশু দুপুরে ছাদে উঠেছিলে কেন?
নিশ্চয় চুল শুকাবার জন্য নয়?

তুমি কি তোমার t -কে এসব বলো নাকি?

সমুদ্র পর্ব

.....

.....

১

সমুদ্রে শুয়ে আছি।
সুতীব্র স্তনের মতো তার ঢেউ
নরোম আবহ দিয়ে ঘুমিয়ে রেখেছে।
আমি তার কেউ নই, শুধু পিঠ পেতে গ্রহণ করেছি
তার দেহ। তার মন, গভীর। লবণ লবণ।
দূরে শাদা কাক, অস্থির সমুদ্রসারস
আমার চোখের দিকে বাড়িয়ে রেখেছে ঠোঁট।

চিৎ হয়ে ভেসে আছি
সমুদ্রের বুকের ওপর। তার দেহ,
সহস্র চক্র ও বাঁক। অনেক নদীর মতো,
তবু একটি একাকী নীল অস্তিত্ব হয়ে
আমাকে ভাসিয়ে রেখেছে।
শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে জল,
নোনা স্বাদ।
মৃতদেহটিকে ঘিরে লবণের তুমুল মৌতাত।
শাদা কাক, সাগরের সারসের মন
একটু আকাশ শুধু জলসৌধের মতোন
ঘিরে আছে।

এই প্রেম, সমুদ্র সমাধির ভেতর চিৎ হয়ে
শুয়ে থাকা। পৃথিবীর নীল বাথটাবে
বিছানার মতো ঘুম।
মৃত্যুর মতো মগ্ন,
প্রেমের এ জলমগ্ন রুম।

২
অনাহুত, এসেছি এ অন্ধকারে।
অগ্নিপরিখার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছি দুই হাত।
পোড়াবে, না গলায় জড়াবে?

প্রেমদগ্ধ পুরোহিতের মতো সংসারের চারিধারে পাক খেতে খেতে
অভিসম্পাত করবে না আমাকে!

আজ সর্বনাশ নিজে নিজেই ডাকছে।
সর্বংসহা বিনাশিনীর কাছে যাও, বলছে।

গভীর মন্ত্রপুত প্রীতিকুসুমের মতো
তোমার মুখে কান পেতে আমি স্পষ্ট অক্ষরে
শুষে নিতে চাই কথা। থরো থরো উতলা
আকাশে এঁকে দিতে চাই মেঘ।
মিহি গুঞ্জনের স্বরে আলোচনা করতে চাই হিংসার বাণী।
ইন্দ্রধনুর ইন্ধনে, তাকে সাক্ষী রেখে
তোমাকে বিষাতুর করতে চাই আমি।
তোমার যন্ত্রণার কথা ভেবে কাঁদতে চাই

একা একা, বিরাণ মাঠের ভেতর।

ভিক্ষাপ্রার্থীর সর্বস্ব নাও
সর্বস্বান্ত করে দাও তাকে।

৩
অনেক উঁচু থেকে
ভারী গোলকের মতো
পড়ছি, তোমার বয়সের দিকে।

রসাতলে।

সমুদ্র, তোমারও শেষ আছে।

সে পর্যন্ত পৌঁছাবার মতো
যথেষ্ট গাম্ভীর্য এসেছে।

অর্থাৎ,
দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছি
পরতের পর পরত
জল ঠেলে ঠেলে।

এ ক্ষুদ্র ঘটনার
তুমি অনুভব করছো না কিছুই।

৪
সব ছেড়েছুড়ে একদিন সন্ধ্যার ট্রেনে সোজা
সমুদ্র দেখতে যাবো। হাটিকুমরুলেই নেমে পড়বো মাঝরাতে।
হাটিকুমরুলে সমুদ্র নাই, সমুদ্র ছিল না,
সমুদ্র হবে না কোনো দিন।
তবু সেখানেই যাবো।

এইভাবে চৈতন্য একদিন শ্রীহট্ট থেকে নদীয়া
গিয়েছিলেন। হরি নাম গেয়ে জগৎ মাতিয়েছিলেন।

জগতে হরি নাই, হরি ছিল না
হরি হবেও না কোনো দিন।
তবু জগৎ মেতেছিল তুমুল নামের মৌতাতে।

একদিন সব ছেড়ে ছুড়ে হাটিকুমরুলেই
সমুদ্র দেখতে যাবো।

৫
সহসা দুপুর বেলা
তোমার ভেতর এক খুকি ডেকে ওঠে।
কে ওই খুকি? তুমি না তোমার সন্তান?

সহস্র দুপুরের মধ্যে একটি দুপুর শুধু
আকাশে সেঁটে থেকে
পতপত করে উড়তে থাকে
বীরের হাতে ধরা বিজয়-পতাকার মতো।

জানালার গ্রিল ধরে
শুকাতে দেয়া কাপড়ের ফাঁক দিয়ে
তুমি আর রাস্তা দেখো না ওই দিন। একেকটি
সূর্যরশ্মি পান করো টুপটাপ ঝরে পড়া
জলের মতোন।
খুকিটির কানে কান পাতো
শঙ্খের মতো তার কান সমুদ্রবাহিনী।

একটি দুপুরবেলা
তোমার ভেতর আদি সমুদ্র জাগে।
লবণাক্ত, চঞ্চল, গর্জনশীলা সাগর তোমাকে
উন্মনা করে তোলে।
তোমার হৃদয় থেকে লবণ লবণ ঘ্রাণ
বাতাসে রুদ্ধশ্বাস স্থিরতা আনে।
সময় থমকে যায় একটি দুপুরে হঠাৎ।

৬
যেভাবে আছো ঠিক সেইভাবে বসে থাকো।
কথা ব'লো না কোনো।
ওই গোলকের দিকে দেখো,
পৃথিবীর বর্তুল বিছানায়
সাতটি সাগর পাশাপাশি শুয়ে আছে।
আর ভূমিখণ্ডগুলো আলাদা আলাদা হয়ে
যুদ্ধ করছে নিজেদের মধ্যে।
ওইভাবে বসে থাকো চিরকাল
দেখো সাতটি সাগর পাশাপাশি
নির্বিবাদে শুয়ে আছে।

৭
আমার নাম লেখো ওই সর্বশেষ তালিকায়।

সবার ওপরে, স্পষ্ট অক্ষরে।

কেননা আমারই দরকার একসাথে
আগুন ও অঙ্গার
দহন ও উত্তাপ
শীত ও আতপ।
বিপন্ন জাহাজের সাথে নিরাপদ সৈকত, পাশাপাশি।
সুখী দাম্পত্যের পাশে দিগভ্রান্ত প্রেম।

যারা তোমার হাতে নক্ষত্র এনে দিতে চায়
নির্জন দুপুর বেলা।
চোখের ইশারায় লাফিয়ে পড়তে চায় সাগরে।
সেই হিপোক্রেটদের তালিকায়
প্রথমে আমাকে রেখো।
কেননা কোনো তারকা আমি পেড়ে আনতে পারবো না নক্ষত্রময় আকাশ থেকে।
পৃথিবীকে কোনো কথা চিৎকার করে শোনাতেও পারবো না।
তবু গোপনে ভালোবাসা জানাই। কানে কানে বারবার বলি, চিরগোপন রেখো
আমার দগ্ধীভূত ও উত্তপ্ত হবার ইতিহাস, কাউকে ব'লো না।

৮
এই ছোট বাঙলায় একটা একলা মেঘের
বৃষ্টি হচ্ছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন বৃষ্টিতে
ভিজে যাচ্ছে পর ও অপর বাংলা।
পুবদিক থেকে হাওয়া বইছে।
প্রথমে তোমার তারপর আমার গায়ে
এসে পড়ছে ঝাপট ঝন ঝনন ঝঞ্ঝার।
শপাং শপাং বাড়ি খাচ্ছে।
তুমি বুঝেও বোঝো না, অনুধাবন করেও করো না।
না বোঝার ভান রক্ত হিম করে দিচ্ছে।
পরিস্থিতি হাঁটু পর্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে।
আর ওপরে ওঠানো ঠিক হবে কি না জিজ্ঞেস করছি।

রবিবাবু প্লিজ, থামাও তোমার এই ঘন বরিষণ
এইভাবে টানা তিনদিন বৃষ্টি হলে
আমি পাগল হয়ে যাবো।

৯
চোখ বন্ধ করলে লালচে অন্ধকার। নির্জন নির্মল মধ্যম দুপুর।
পায়ের নিচে অচেনা পাড়ার স্বল্প পরিচিত শীতকাল। ইতস্তত চলাফেরা।
ফোনে পঁচিশ সেকেন্ডের আলাপ। কলিংবেলের শব্দ ছাড়াই
দরজার খুলে যাওয়া ।
মাছ পুড়ে যাচ্ছে... শাক পুড়ে যাচ্ছে...।
টিভি খুলে বসো, ভাতটা উঠিয়ে এই আসছি বলে।
সর্বত্র রান্নাবান্না চলছে এ ভরপুর মধ্যদুপুরে।
শাড়িতে মুখ মুছতে মুছতে মাছভাজার গন্ধ।
সাথে একটু একটু প্রেম। আজ যাও...এখুনি তুতুনকে নিয়ে ফিরবে রহিমা।

কুকুর

.....
থেকে থেকে কোথাও কুকুর ডেকে ওঠে।
কান পেতে শুনি তার ডাক।

কামনার সন্ত্রাসে সিনা টানটান করে তাকাই
চারদিকে। তুমুল বৃষ্টিতে সহস্র ইন্দ্রিয়
তোলপাড় করে ওঠে।
শরীরবৃত্তের মধ্যে তার ডাক
শরীরের ভাষায় কথা বলে।

সহসা এক বেওয়ারিশ কুকুর ডেকে ওঠে
এ ভরা ভাদ্রমাসে।

তুলকালাম বজ্রবাতাসে কান পেতে
বুঝে নিতে চাই
কত দূর থেকে একা একা ডাকছে
কামনাকাতর, স্মৃতিসন্ত্রস্ত বিরহী কুকুর।

ইতিহাসের চূড়ায় বসে

.....

এই সমাসন্ন বর্তমানে
ইতিহাসের চূড়ায় বসে পা দোলাইতেছি
আর স্পষ্ট দেখতেছি
মৃত সম্রাটের পুত্রধন একা একা কাঁদতেছে।
সহসা ভোল পালটায়ে ম্যাকিয়াভিলি
গভীর বক্তৃতা দিতেছেন
সারস্বত সম্মেলনে।
কখনও এইভাবে ইতিহাস
গায়ের ওপর এসে পড়ে। পাখির বিষ্ঠার মতো
আচানক কাপড় নোংরা করে দেয়।
এখন এই আপদ শুকানো পর্যন্ত
বাধ্য হয়ে পরিষ্কার রোদে
দাঁড়ায়ে থাকতে হবে।

অর্থাৎ, ঠিক ঠাক বৃষ্টি হচ্ছে

.....

বৃষ্টি হচ্ছে। কখনো ঘুমানি, কখনো ঝিরঝির, কখনো ঝরঝর। কখনো মাতাল বৃষ্টি, কখনো তালে ঠিক। হাজার রকমে ঝরছে পানি এই ঘোর কলির বর্ষায়। আবার এসেছে আষাঢ়, গান করছি। গতবছর যেন আসোনি, ভুলে। এইবার এসে গেছো। অর্থাৎ, ঠিক ঠাক বৃষ্টি হচ্ছে। মানে রাস্তায় কাদা হচ্ছে, মাথায় ছাতা হচ্ছে। রিকশায় ঝাপটা লাগছে। ভিজে যাচ্ছে, যা ভেজার। কাদা এড়িয়ে, গা বাঁচিয়ে চলছি এই ঘনঘোর কলির বর্ষা। ফ্লু হচ্ছে, এন্টিবায়োটিক হচ্ছে, ভাইরাল ফিভার হচ্ছে। তার মানে ঠিকঠাক পুরো বাংলা জুড়ে এসেছে নতুন ঋতু। স্থান ছেড়ে দিতে হবে না। ও এমনেই এসে চলে যাবে। সব মাথায় ওপর দিয়ে চলে যাবে, বৃষ্টিবাতাস। কিছু বুঝবোই না। মাথায় ওপর দিয়ে শরতের মেঘের মতো হাইথট বর্ষাকাল দেখতে দেখতেই চলে যাবে।

ভাবছি। অবাক হচ্ছি। সন্দেহ করছি, আসলেই যেমন বলা হচ্ছে সেভাবেই হচ্ছে, নাকি একটু আলাদাভাবে ঝরছে জল। ফোন করে, মেইল করে, এসএমএস করে খবর নিচ্ছি। তোমাদের ওখানে ঠিকঠাক ঝরছে তো? এইভাবে হঠাৎ জেনে যাচ্ছি, তুমি স্বেচ্ছায় বৃষ্টিতে ভিজছো। খুব রোমান্টিক আইডিয়া। আহা কতদিন ভিজি না। আমাদের সবার পক্ষ থেকে তুমি ভিজছো। এই ভাল। কিন্তু তোমার ফোনের কী হলো?

ফোন বাঁচিয়ে ঠিকঠাক ভিজতে পারলে তো? এই বর্ষায়?

যিনি আয়নার কারিগর

.....

সেই দয়াল বাবার দিকে চেয়ে আছি। যদি পুনর্জন্ম পাই, যদি আরেকবার এই শীতাতপ পৃথিবীতে নিজের মতো করে জন্মাবার সুযোগ জোটে। তবে আমি আয়নাই হবো। বস্তুপৃথিবীর অলীক জগতে প্রতিবিম্ব ধরে থাকবো। অপার প্রতিবিম্বের আধার হয়ে আমি সটান দাঁড়িয়ে থাকবো প্রিয়তম নারীর ঘরে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে জীবিত বস্তু হয়ে তাকিয়ে থাকবো তার দিকে। প্রতিপল, প্রতিটি প্রহর।

পৃথিবীর দিকে আয়নার মতো করে তাকিয়ে থাকবো। মানুষের কলবের ভেতরের আয়না, মানুষের কলবের বাহিরের আয়না নয়। কোনো রূপক, কোনো সংকেত নয়, স্রেফ একটা আয়না হয়ে; চিরনীরব চিরচমৎকৃত চিরসুখী হয়ে পুনর্জন্ম পেতে চাই। তাই আয়নার কারিগরের সামনে জানু পেতে বসে আছি, করজোড়ে।

শরীরের দরজা

.....
একটিই দরজা এই পৃথিবীতে তোমার আর আমার মাঝখানে।

প্রতিটি দরজাকে বারবার সেই দরজা বলে ভুল হয়ে যায়। একে একে সমস্ত দরজা পার হই, তবু তোমার কাছে পৌঁছাতে পারি না।
অপার সাগরের লবণের মাঝে লাবণ্য হয়ে বসে থাকো। তোমার দেখা পাই না। কোনো সংকেত নাই, স্মৃতি নাই, ইশারা নাই। তবু আমার অহং তোমাকেই খুঁজে নিতে বলে। সমস্ত ইন্দ্রিয় পাহারায় রেখে আমি বসে থাকি, যদি আসে কোনো সাড়া, কোনো সংবাদ। কোনো গন্ধ, কোনো গান যদি নিভৃতে ভেসে যায়।
তুমি চুপ করে বসো থাকো। অথবা পৃথিবীর কোনো নীরবতার ভেতরই থাকো না তুমি।

কিন্তু জ্বরের ঘোরে আমি শুনে ফেলি অস্ফূট কামনার স্বর :
শুনি যে, চুমোই হলো শরীরের আশ্চর্য দরজা।

সন্ধ্যা

.....

১

দিন ও রাত্রির ফাঁকে ফুটে থাকা অবাক এই ফুল : সন্ধ্যামালতী। অথবা সন্ধ্যা নিজে নিজেই এক মহাজাগতিক কুসুম। বকুল যেভাবে একা একাই একটা মেয়ে।

সন্ধ্যা নামের ফুলের পক্ষ থেকে ফোটে পৃথিবীর তাবৎ সান্ধ্যকুসুম। যতসব নামী-দামী, মহৎ-মহান, বেনামী-বেজন্মা, অথর্ব-অনাথ ফুল সন্ধ্যার কথা মনে করে করে ফোটে। সন্ধ্যার উদ্দেশে তাদের চকিত প্রস্ফূটন।

তাই সকল ফুলের মাঝে সন্ধ্যা : অলীক অদৃশ্য এক ফুল।

বিদ্যুৎবেশী নর্তকীর মতো, মিহি মসলিনের আড়ালে ফুটেই মিলিয়ে যায়।

দৃষ্টিপরাহত, চিরঅনাঘ্রাত এই ফুল।

২

সন্ধ্যা : খণ্ড সময়। নিমরাত্রি। অতিদিন।

তোমাকেই সন্ধ্যা বলি। বলি, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। যেন তোমার আসার সময়টুকুই তোমার নাম। যেন ওই সময়টুকুই তুমি। সারাদিনের ইলেক্ট্রনিক জলাঞ্জলির পর সাইবার জঙ্গলের ভেতর ওঁৎ পেতে বসে থাকি। অথবা সময় স্বয়ং সন্ধ্যার ক্যামফ্লেজে বসে থাকে তোমার অপেক্ষায়।

বসে থাকি আমি ও সান্ধ্যসময়- পরস্পর। তুমি আসো সন্ধ্যা সমভিব্যহারে। তোমার ভেতর ক্রমে ঘন হয়ে আসে সন্ধ্যা। তোমার ভেতর থেকে লাফ দিয়ে নামে পৃথিবীতে।

সন্ধ্যা আসে, সন্ধ্যা নামে, সন্ধ্যা ঘনায়। মানুষের পৃথিবীতে আরেকটা মানুষের মতো। নারীদের মধ্যে আরেক নারী।

U

...

যারা শরীর সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, সারাণ স্লিম হয়ে থাকে, ক্ষুধা পেলে শসা খায় তাদের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে। ইয়োগা ভাল জিনিশ, এক্সারসাইজ আরও ভাল। তারও চেয়ে ব্যালান্সড ডায়েট। এইসব করো বলে তোমাকেও ভাল লাগে। তোমাদের ত্বকে, স্লিম দেহে হেসে উঠবে আগামীর বাংলাদেশ। তবু ভাষা কিন্তু একটা বড় সমস্যা। বিশেষত বানানরীতি। তোমার সাথে কথা বলতে বলতে কতবার যে গুগলে সার্চ দেই জানো না তো। জানলে হাসতে হাসতে পেট ফেটেও যেতে পারতো তোমার। তবু বোঝার জন্য কথা বলি। তুমি কী ভাবে ভাবো, তোমার দিন কেমনে কাটে বোঝার চেষ্টা করি। কথা বলতে কিন্তু ভয়ই লাগে। আর এত স্লিম হয়ে আছো আর এত ভাল ইংরেজি জানো। কত প্রাকটিকাল আর মেল সাইকোলজিও বুঝো। সবই কিন্তু পজেটিভ ব্যাপার। আমরা এরকম না। আমাদের হঠাৎ হঠাৎ মন খারাপ হয়ে যায়। আমাদের ভেতর একটা একটা করে অভিমানী ছিঁচকাঁদুনে বসে আছে। মিলে না তবু তোমার সাথে কথা বলি। দূর থেকে মেশার চেষ্টা করি। তোমার সপ্রতিভতা, ক্ষিপ্রতা দেখি। তোমাদের লঙ লেগে একদিন দাঁড়াবেই বাংলাদেশ। পিছায়ে থাকতে থাকতেও আমি একটু আগায়ে থাকার চেষ্টা করি। তোমার মারফত আমি অনুধাবন করি সময়। আমার বদ্ধমূল পুরনো ধারণা থেকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি, যদি তোমার মাঝেও থেকে থাকে কোনো ছোট দুঃখ। কোনো ক্ষুদ্র অভিমান। তুমি কোনোদিন একা একা ছোট কোনো কষ্টে কাঁদতে পারো কি না, ভাবি। সেইদিন হয়তো আমাকে তোমার কাজে লাগতেও পারে। তাই না?

চলো চিঠি লেখালেখি করি

.....

ভাল করে চিন্তা করে দেখ, চ্যাটবক্সে এইসব আলাপের চাইতে
চিঠি লেখাই ভাল কি না। এক মিনিট দেরি হইলেই
যেরকম অস্থির হয়ে যাও, তাতে কিন্তু ভয়ই লাগে।
চিঠির জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হলে তুমি হয়তো
সম্পর্কই রাখতা না। এমনকি ফোনও
বন্ধ করে একা একা কানতাই খালি। তাই মাঝে মাঝে ভাবি এইসব
আইএম বন্ধ করে আবার আধুনিক যুগে ফিরে যাবো। গাদা গাদা চিঠিই পাঠাবো
তোমার ঠিকানায়।

যদিও অপেক্ষার অভ্যাস করার উপযোগী সেই চিঠিযুগ ফিরিয়ে আনা কঠিন।
কেননা, আমি জানি- তুমি নিশ্চিত জানো না তোমার পাড়ায় পোস্ট অফিস ঠিক
কোথায়। যে তোমার কাছে চিঠি নিয়ে যেতে পারে তার চেহারা কতটা শুকনা।
এমনকি দুইটাকার হলুদ খাম এখন কত টাকায় বিক্রি হয় তাও জানো না।
আমিও জানি না।
সবচেয়ে বড় কথা, তোমার আদ্যপান্ত সব জানলেও ঠিকানা জানি না। তোমার
সম্পর্কে যা জানি, যতটুকু তুমি বলেছো আর যতটুকু আমার অনুমান সে
অনুসারে একজন ডাকপিয়ন তোমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না।

পুরানা কত কিছুই তো ভাল লাগে। চিঠিও ভাল লাগতে পারে। চলো ট্রাই করে
দেখি একবার। আমার ঠিকানা রইলো, তোমার ঠিকানা আমি কাউকে দেবো না।
ভয় নাই।

চলো পাড়ার পুরনো ডাকঘর কোথায় জেনে রাখি। চলো চিঠি লেখালেখি করি।

বকুল

.....

আমি তোমাকে বিনয় মজুমদারের কবিতাই বরং শুনাই।
টেনে টেনে পড়িই বরং। কী বলো?
কেননা যে কথাটা কইতে চাইতেছি ইনিয়ে বিনিয়ে সেই কথা
উনি স্পষ্টভাষায় বলে গেছেন ১৯৬৫ সালে।
ফলে নতুন করে কবিতা লেখারও আর দরকার মনে করতেছি না।

মাঝে মাঝে আমি এই অকৃতদার লোকটার কথা চিন্তা করি
একবার প্রেমে পড়েই উনি কেমনে যৌনতা, শরীর ও সম্পর্কের গুঢ়রহস্য
পুরাটাই অনুধাবন করছিলেন, বুঝি না।
আগে যখন বিনয়ের কবিতা পড়তাম
তখন বিনয়ের কবিতা অর্ধসত্যের মতো মনে হইতো।
ভাবতাম এইগুলা কী লিখছে এই পাগল,
এখন ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ে কালো লাম্বা লাইনগুলা
বিনয় যা বলছে ঠিকই বলছে তাইলে, আনমনে বলি।
বিশেষ কইরা বকুল ফুল বিষয়ে
উনি যা কইছেন তা সর্বৈর্ব সত্য

ফলে তোমাকে ইনিয়ে বিনিয়ে কিছু দরকারি কথা বলার চাইতে
মহাত্মনের কিছু কবিতা শোনানোই যথেষ্ট মনে করতেছি।
শোনবা নিকি?

খই

....
আমি তো প্রচুর খই খেয়েছি জীবনে।

দেখেছি কড়াইয়ে গরম বালুর ওপর ধান
এইসব খই মুড়ি তাদেরই সন্তান
মুড়ির চেয়ে খই ভালো লাগে
মোয়া ভাল লাগে ঢের মাখানো মুড়ির চেয়ে

নিজে খই খেয়ে অন্যদের মুড়ি খেতে বলায়
আলাদা আনন্দ আছে।
যার কাজ নাই তাকে খই ভাজতে বলার পর
বেকারত্ব সমস্যা নিয়ে গভীর ভাবনার অবকাশ আছে।

গরম বালুর ওপর ফুটন্ত খইয়ের কথা
সহসা মনে পড়ে
ততোধিক মনে পড়ে আলিশা চেনয়ের কথা
কেননা তার শরীরে খই রেখে
একটি মডেল খই খেয়েছিল।

ভাবি সেইসব খইয়ের কথাও।

সেই সব খই কোথায়
যারা তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে
মনের ভুলে পড়ে গিয়েছিল

কবুতর ও ঘুঘুর মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে

.....

কবুতর অত্যন্ত ভাল পাখি। উড়তে পারে।
অত্যন্ত পেলব ও নরম এই পাখি মানব সমাজের ধারে-কাছে থাকে।
যারা ঘুঘু দেখেছন তারা এই পাখি সম্পর্কে কিছুটা জানেন বলে
ধারণা করা যায়।
কারণ কবুতর দেখতে অনেকটা ঘুঘুর মতো।
ঘুঘু নিরব দুপুর বেলা সন্তর্পণে ডেকে ওঠে। অত্যন্ত গোপনে।
অথচ আধুনিক পৃথিবীতে কবুতর সারাবেলাই ডাকে।
বাকুমবাকুম (২) করে ছোট ছোট উড়াল দেয়। থেকে থেকে।
যারা ঘুঘু দেখেননি তাদের কবুতর সম্পর্কে বোঝানো কষ্টসাধ্য।
তাই, তাদের জন্য এই কবিতা প্রযোজ্য নয়।

উনার সঙ্গে শিল্প ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিষয়ে কথোপকথন

.....

বুঝছেন তো এইবার।
আমার একটা দুপুরই দরকার আসলে।
বিছানা-বালিশ, নীরবতা-নির্জনতার চাইতে জরুরি এই জিনিশটা।
একটা আস্তা দুপুর।

একটা জিনিশ বলেন তো দেখি,
প্রতিদিন যে আপনে ভাতঘুম দেন
তাতে আপনার রাতে পবলেম হয় না?
হবার কথা কিন্তু।
যদি পারি একবার আপনার ওইখানে যাবো
আপনে কেমন করে ঘুমান দেখে আসবো
ঘুমের সময় হা করেন কি না, নাকও
কি ডেকে থাকেন কখনো? এইসব দেখতে চাই

সামান্য বলছেন দাদা?
ভাবুন,
আমাদের তো দুপুরই নেই।
এখেনে সাহিত্য কীভাবে হবে!

আপনাদের আছে মেলা মেলা দীর্ঘ দুপুর
ভাতের পর ভাতঘুম
ঘুমের ভেতর নাক ডাকা
বলতে গেলে দাদা
এটা কিন্তু, এই যে, এই নাক ডাকা
একে অবচেতনের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই বলতে হবে।
এ বিষয়ে আপনের কী মত?

দাদার তো মনে থাকবার কথা
একবার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিয়ে বলছিলেন
আপনার দখল আর জ্ঞানের গভীরতা দাদা
খুব অবাক হয়েছিলাম।
আমাদের তো এইসবও নাই।
বুঝেন না?
কে শুনবে। একেবারে ভূতের দেশ, বুঝলেন।
একেকটা ভদ্রলোকের শার্ট খুলে দেখুন
কাদা লেগে আছে।
বিশ্বাস হয় না?
না হবারই তো কথা অবশ্য।

মাহবুব মোর্শেদ

জন্ম : ২৯ জানুয়ারি, ১৯৭৭।